প্রাক্‌ কথন

বাংলা উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব মূলতঃ বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের তিন প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমাজ-ব্যাখ্যার আলোচনা। এই আলোচনার একটুকুই বৈশিষ্ট্য যে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই সমাজ-ব্যাখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। সাহিত্যকে সমাজ-অর্থনীতির বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটে ও তার অনিবার্য প্রভাবকে স্বীকার করে বিচার ও মূল্যায়ন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে খুব একটা সুলভ নয়। কেননা, সাহিত্য ও সমাজ-অর্থনীতির অনিবার্য যোগসূত্র ও প্রভাবকে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সমালোচক ঠিক স্বীকার করতে চান না। তেমনাই বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, -"বাস্তবের ও কল্পনের সাড়া সাহিত্যে আছে বলিয়াই যদি সাহিত্য উহাদের সাম্রাজ্যের উপর অন্তর্ভুক্ত করি, তবে মনুষ্যজীবন বিভিন্ন স্তরের সমাজপুরে দুর্বোধ্যের অরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল, সাহিত্যেও তাহার সেইরূপ ঘটিতে পারে। বাস্তবের স্থূল তথ্য ও কবি মনের বহুমাত্রিকের সূক্ষ্মতর সমন্বয়ান্তিত্বের সাম্রাজ্য-পরিচয় চৈতন্যের দ্বন্দ্ব ইহা সত্য, কিন্তু [illegible] কবি-কল্পনা শ্রেণীর মনের ন্যায় সুদূরপ্রসারী রূপ পরিবর্তনের সাধনা, উহার বিলম্বের নানা স্তরের মধ্যে [illegible] তলদেশে সৃষ্টি রহস্যকে সমাজের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। ও অন্যান্য [illegible] কাছুহুন মনের অন্তর্ম্মুখতাই সমাজদৃষ্টি হইয়া সার্থকতা লাভ করে।" (ঃ [illegible], কবিতা, পৃঃ ১২)। অন্য এক সমালোচক এই আলোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন: "..... বিশেষণ নির্ভর সত্যতা পর্যন্ত মার্কসবাদ পৌঁছে দেয়। তার চিন্তার চূড়ান্ত ফলে তৈলিক বিচার পদ্ধতি নিয়েই।" (সমালোচনা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, তেত্রিশ পৃষ্ঠা, পৃঃ ৩৬)। এই মন্তব্য করার সময়ে সমালোচক ভুলে যান যে 'বিশেষণ' বা 'তৈলিক বিচার পদ্ধতি' বলে সমালোচক যে একটি স্থির নির্দিষ্ট প্রভাবকে ইঙ্গিত করছেন সেটা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের মূল প্রভাবকে স্বীকার করলে তেমে পড়তে বাধ্য, কেননা, সমাজ-অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তনের

অংশ যখন অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের মতো শিল্প সম্পর্কিত মূল্যবোধও পাল্টে যায়। মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তারা আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনা না করলেও তাঁদের গ্রন্থাদির বিভিন্ন মন্তব্য ও চিঠিপত্র, লেনিনের টলস্টয় সম্পর্কিত আলোচনা এবং পরবর্তীকালে কডওয়েল, ফক্স ও অন্যান্য মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের মূল প্রত্যয়কে ভিত্তিই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বর্তমান সমালোচক মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক বিচার পদ্ধতিকে একটি সুসংগঠিত বিচার পদ্ধতি হিসাবেই মনে করেন এবং বর্তমান আলোচনায় এই পদ্ধতিকেই পূর্ণভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। ত্রুটি যদি ঘটে থাকে, এবং যেখানে ঘটেছে, সেটা বর্তমান সমালোচকের মূল্যবোধ ও প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটি, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ত্রুটি নয়।

পশ্চিমে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে সাহিত্যের সটিক বিশ্লেষণ ও উদ্বোধনের বিশ্লেষণের এক উদ্বোধনা কাজ অনেকদিন ধরেই চলেছে। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামাজিক সম্পূর্ণ মূল্যায়নের কাজগুলি - বিশেষ করে তাঁর Studies in European Realism, The Meaning of Contemporary Realism, The Historical Novel ইত্যাদি গ্রন্থে। তাঁর পরিচিত ওয়ানটাং (Walter) বেনজামিনের Illumination ও Reflections - এর প্রকাশনীতে আছে এই পদ্ধতির উদ্বোধনা উদাহরণ। ফরাসী পণ্ডিত লুসিয়ঁ গোল্ডম্যান-এর The Hidden God, Towards a Sociology of the Novel এবং Sociology of Literature প্রমাণ করে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি কী ভাবে গঠনবাদে উপন্যাস রচনার সামাজিক পটভূমিটি, শ্রেণীগত অবস্থানে লেখকের মনোভঙ্গী এবং রচনার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে পারে। মার্কসবাদী পদ্ধতির প্রাথমিক ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে আর্নল্ড হাউজারের সম্পর্কিত গ্রন্থের উল্লেখ করা চলে। ইঙ্গ-মার্কিন সমালোচকদের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগের উদাহরণ তেমন দেখা যায় না, তার কারণের কাছে পাশ্চাত্য দেশে এমনই বেশেষ, ইঙ্গ-মার্কিন এবং সেই কারণে আমাদের দেশের সমালোচকদের মধ্যেও এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত বিরল। তবুও, আমরা কেউ কেউ মার্কসবাদী পদ্ধতিতে ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করেছেন। যে সমস্ত

ইংরেজ সমালোচক মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি সাহিত্যের সমালোচনায় ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনার আত্মিক গভীরতা অবশ্য মূল মুখোশ মুখোশের মণীষীদের স্তরের নয়, তবু রেমন্ড উইলিয়ম, রিচার্ড হোগার্ট-এর রচনাবলী, ডেভিডের Fiction:The Novel and Social Reality এই ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রণালীদের আলোচনা। ল্যুকাস কম্যুনিটির The rise of the Novel - এও এই পদ্ধতির আংশিক ব্যবহার পাই।

বাংলায় ড: অরবিন্দ পোদ্দারের ১৯৫১ সালে প্রকাশিত সঞ্চিতবাসনাই এরকম আলোচনার প্রথম সুসংবদ্ধ একাডেমিক প্রয়াস। তার আগে, নীরেন্দ্র নাথ রায়, গোপাল হালদার, বিষ্ণু ঘোষ, অলোক ভট্টাচার্য, অলোক নন্দ, সেবারী সেন প্রমুখের বিক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, ১৯৫৫ সালে নীরেন্দ্রনাথ তাঁর এইসব আলোচনার সমন্বয়টিতে সাহিত্যবীক্ষা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। গোপাল হালদারের লেখা সাহিত্যের মূলরেখা গ্রন্থের দুটি খণ্ডও এই পদ্ধতিতে আলোচিত গ্রন্থ বিশেষের উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে, ড: অনোমকৃষ্ণ জানা, ড: সুবোধ ঘোষের মিত, ড: শুভঙ্কর জানা প্রমুখেরা এই ধরনের আলোচনার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু তাঁদের আলোচনা সার্বজনীয় ও সমাজনীয় আলোচনার একটা সংমিশ্রণ বলেই আমার মনে হয়েছে। এছাড়া, বনফুল নাম সম্মানিত সার্বজনবাদী সাহিত্য-বিতর্ক(১) - এ ভবানী সেনের ১৯৫১ সালের 'একজন মনস্বী ও একটি পত্রাবলী', পঞ্চানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতকের বাংলার বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা' বা তৃতীয় খণ্ড মুখোশের সরকার লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্নিযুগ' প্রভৃতি আলোচনাগুলিকে এই ধরনের আলোচনার বিক্ষিপ্ত সূত্রপাত হিসেবে ধরা যাবে। সাম্প্রতিককালে এই পদ্ধতির সুদক্ষ উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের প্রয়াস রেখেছেন শ্রী প্রমথ ভট্টাচার্য তাঁর 'মধ্যবিত্তের যাত্রা ও তারাশঙ্করের উপন্যাস : 'কৈফিয়ৎ পূর্ব' প্রবন্ধে এবং ঐতিহাসিক শ্রী সুকুমার রায় তাঁর কিছু কিছু ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলীতে। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের প্রধান লেখকদের

প্রণালীবদ্ধ সুসংহত একত্রিত আলোচনা ইতিপূর্বে এই পদ্ধতিতে করা হয়নি। বর্তমান গবেষণা সেই দিকে একটি বিনীত পদক্ষেপ।

বর্তমান আলোচনার পরিক্ষেত্র-বিস্তার ও সংক্ষিপ্ত-বিস্তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রসঙ্গত বলা দরকার। এ কথাটা বোধহয় আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে একটি নির্দিষ্ট দেশকাল লেখকদের জন্য তেমনভাবে উদ্দীপক ও প্রভাবিত করে এবং লেখকদের সৃষ্টিকে দেশ ও কাল বিচিন্ন করে অনিবার্যরূপে, শুধু তাই আবেদনের দিক থেকেই নয়, বুদ্ধিগত বা অর্থের দিক থেকেও। তার প্রমাণ মেলে উপন্যাসের উপন্যাসে - উপন্যাসের বিশিষ্ট আবেদনে, তার বিশিষ্ট শিল্পরূপেও। বিশেষতঃ উপন্যাসের মূলগত সেটি দেশকাল,- বিশিষ্ট ও অসাধারণ মানুষকে নিয়ে, সেই মানুষের সংঘাতকে নিয়ে। তাই কোন নির্দিষ্ট দেশকালের নির্দিষ্ট আকার উপন্যাসে সেই বিশিষ্ট ভাবাভাবী মানুষের সেই নির্দিষ্ট সময়ের খুঁজে পাওয়া খুবই সম্ভব। কোন একটিমাত্র উপন্যাসে বা কোন একজনমাত্র ঔপন্যাসিকের লেখায় সম্পূর্ণ দেশকালকে খুঁজে পাওয়া না যেতে, কোন এক নির্দিষ্ট কালের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের আলোকে সেই বিশিষ্ট কালটিকে ধরা সম্ভব। বর্তমান আলোচনায় আমরা উপন্যাসের তিন প্রধান শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে এই তিন শিল্পীর জীবনকালের বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ জীবনের উপন্যাসে কতোটা চিত্রিত হয়েছে এবং কিভাবে, পুরো দেশকাল চিত্রিত হয়েছে কিনা হয়নি, না হয়ে থাকলে কেন না হবার কারণগুলির সম্ভাব্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা, একটি উপন্যাসের সার্থকতা সেই উপন্যাসে আবদ্ধ দেশকালের ঐতিহাসিক সমাজবাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলনে অথবাই নয়। তাছাড়াই উপন্যাস এক সমুদ্রের উপরের অথবা উপন্যাসের সার্থকতা-ব্যর্থতার প্রশ্নই জড়িয়ে আছে। তাই এই সন্ধান শুধুমাত্র সাময়িক ঐতিহাসিকের সন্ধানেই সীমাবদ্ধ নয়, এরই সঙ্গে উপন্যাসিক শিল্পীর অনুসন্ধান প্রচেষ্টা। প্রসঙ্গতঃ, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস উপন্যাস পর্যন্ত আমার আলোচনার

কালসীমা। অধ্যাবধি হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধ্যাবধিও বটেন। এই অন্তর্বর্তীকাল অন্তর্গত এই তিন প্রধান ঔপন্যাসিক তিন অন্যান্য প্রধান ঔপন্যাসিককে আমার আলোচনার বহির্ভূত রেখেছি এই জন্যই যে তাঁদের সীমাবদ্ধ সাফল্য এই তিন প্রধানের কারো না কারো অনুসারী হিসেবেই এবং তাঁদের আলোচনায় বাংলা ঔপন্যাস ও বাঙালী সমাজের এমন নতুন কোন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয় যা এই তিন প্রধানের ঔপন্যাস আলোচনায় পাওয়া যাবে না।

আমার সম্পূর্ণ আলোচনাটি মূলতঃ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যার প্রথম অধ্যায়ের শীর্ষনাম 'সমাজবাস্তব ও ঔপন্যাস ঔপন্যাস'। এই অধ্যায়ে একটি ঔপন্যাসের সার্থকতা-ব্যর্থতার সীমানির্দেশের চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক সাহিত্য-প্রচেষ্টাই মূলতঃ স্রষ্টার সৃষ্টিতে দেখা সৃষ্টি ও জগৎ প্রসূত এবং সুধীগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ পড়ে থাকে স্রষ্টার দেশকাল, তাঁর সামাজিক পরিবেশ। তাই স্রষ্টার দেশ-কাল অনিবার্য নিয়মে কোন না কোন ভাবে তাঁর সৃষ্টিতে ছায়া ফেলে। বিশেষতঃ ঔপন্যাস যেহেতু নির্দিষ্ট দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সংগ্রাম-সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে জীবনের পুনর্গঠনের, স্রষ্টার জীবনে প্রতিষ্ঠা ব্যর্থতার কাহিনী, সেহেতু ঔপন্যাসে দেশকাল নির্দিষ্ট সমাজপরিবেশের তথা সমাজবাস্তবতা অনিবার্য, কিন্তু বলা চলে যে এই সমাজ বাস্তবতার সন্ধানের মূলেই ঔপন্যাসিকের সত্য-দৃষ্টি নিহিত হয়ে থাকে। 'জীবনকে জীবনেরই মতো প্রতীয়মান করানোর জন্যই ঔপন্যাসকে জগতের সামনে ধরতে হয়' - ঔপন্যাসের বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে শ্রী অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের এই সংজ্ঞা সমালোচকের মূল্যায়ন ও সমাজবাস্তব সমালোচকরা স্বীকার করে নেন, কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় এই 'জীবনেরই মতো প্রতীয়মান' করানোর প্রয়োজনে একটি নির্দিষ্ট দেশ-কাল-পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজনে সাধক শিল্পী জটিল কবিত্বের সমন্বয়ে লেখক যে নির্দিষ্ট কালটিকে তুলে ধরেন তার ঐতিহাসিক যথার্থ সম্পর্কে। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক এই

ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করে নেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যেহেতু শক্ত ও কর্তৃত্বশীল শ্রেণীসমূহের ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাস ও এই শ্রেণীসমূহের ভিতর দিয়েই মনুষ্য সমাজ সামাজিক এক বিন্যাস থেকে অন্যতর বিন্যাসের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তবুও ঔপন্যাসিকের সার্থকতা তথা সমাজবাস্তবতার যাথার্থ নির্ভর করবে কোন একটি ঔপন্যাসের মধ্যে চিত্রিত দেশকালে নির্দিষ্ট সমাজের এই যথার্থ ঐতিহাসিক সামাজিক বিন্যাসকে তুলে ধরার ভিত্তিতেই। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে, বাংলা দেশের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট উদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর বাস্তবতা বিভিন্ন প্রকারের আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমের পরে পরে লেখক যখন তাঁর পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ইতিহাসগত ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করে তোলেন তখনই পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট উদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর সমাজবাস্তবতা তার ঐতিহাসিক যথার্থতায় ফুটে ওঠে। তাই সমাজবাস্তবতা বলতে আমি নির্দিষ্ট দেশকালের সামাজিকবিন্যাস বিচিত্র ও সামাজিকশ্রেণীর গঠন সমূহ ও ব্যক্তি সত্তাতে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া তথা ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকাকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে ধরার কথা বলতে চেয়েছি যার দ্বারা ইতিহাসের প্রবাহমানতায় এই সামাজিকবিন্যাস বিষয়, মানুষ ইত্যাদি একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে সংহত হবে, বর্তমানকে অতীত ও বিন্যাসের ঐতিহাসিক যোগসূত্রে গ্রথিত বলে বোঝা সম্ভব হবে।

বাংলা ঔপন্যাসের আলোচনায় বাংলার বর্ণসমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ণও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেননা, ইংরেজের প্রথম দখল ও ক্রমশঃ সত্তা কেন্দ্রীকরণের চেষ্টায় এবং ইংরেজী শিক্ষা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে

'বাঙালী সমাজে যে পরিবর্তন' র সূচনা, তারই ফলে বাংলা উপন্যাসেরও উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এই সময়েই মুঘল সাম্রাজ্যবন্ধন থেকে সমাজ কিছুটা মুক্তি পেয়েছে, বাঙালী সমাজে ঊর্ধ্বমুখ ও আনুভূমিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, নতুন শহর গড়ে উঠে শহর ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে প্রভাব, পার্থক্য ও টেনশন শুরু হয়েছে, সামাজিক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়েছে, বিশিষ্ট ধরণের পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে একটি কৃষ্টিবান শুভানুধ্যায়ী পাঠকশ্রেণী তৈরী হয়েছে এবং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মানুষের পরিচয়ের ফলে সংস্কৃতি ও রুচি সম্পন্ন একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে যে বাঙালী ছিল, মুক্ত ছিল, একই সঙ্গে স্বপ্নবাদী ও সংবাদবাদী যৌক্তিক ছিল - তার ফল পড়েছে বাংলা সাহিত্যে, সুতরাং বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা উপন্যাসকে বিশেষ করেছে। সেজন্য ইদানীং সমালোচকরা দ্বিতীয় স্তরে বাংলার উপন্যাসগুলির সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা অর্থ বিশেষ আলোচনা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। কেননা, বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল্যায়ন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন ভিন্নতর হয়ে থাকে, সেজন্য পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খুবই মূল্যায়ন ভিন্নতার কারণ বাংলার উপন্যাসগুলির মূল্যায়নের ভিন্নতা। যেমন ড. প্রবিণ শেখ দাবি করেন বাংলার উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর 'বঙ্কিম মানস' গ্রন্থে বলেন যে ইংরেজ শাসন ও 'ভারতীয় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়াছে' বা ইংরেজ শাসনে 'পূর্বতন ভারতীয় সমাজের প্রাচীনতম শ্রেণীসমূহের স্থায়ীন প্রবলুপ্তি' ঘটিয়াছে বিশ্বাস করেন তখন তাঁর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্য সমালোচক বরাবরের মূল্যায়নের সঙ্গে অনেক যে ইংরেজরা এখন প্রয়োজনেই পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিকব্যবস্থাকে যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছে ও অনেকটাই সফল হয়েছে, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাহিত্যের মূল্যায়নে ভিন্নতা আসতে বাধ্য। এখন এই

যে মার্কসীয় সমালোচক বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেশের ঔপনিবেশিক অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইবেন ও যে মার্কসীয় সমালোচক ঔপনিবেশিক অবস্থার কথা মনে রাখবেন - তাঁদের দু'জনের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগে ভিন্নতা আসতে বাধ্য। এই যুগবিভাগের ভিন্নতায় ও একই লেখকের ভিন্ন সময়ে লেখা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের যুগবিভাগ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন তরানী সেনের লেখা (দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ২য় খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত)। অথবা অন্যত্র, বিভিন্ন সময়ে, মার্কসবাদী বিভিন্ন সমালোচকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের ভিন্নতার মূল কারণও এই নবজাগরণের যুগবিভাগের ভিন্নতার জন্যই ঘটেছে। সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের তিন প্রধান ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের যুগবিভাগের পূর্ব অধ্যায়ে 'অধ্যাপক সুবিনয়ের : বাংলার নবজাগরণ' এই শীর্ষনামে বাংলার নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ যুগবিভাগের চেষ্টা করেছি।

আলোচনার পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনা করেছি। এবং সে আলোচনা সূত্রাকারে বাংলার নবজাগরণের মূলসূত্র অবলম্বন করেই। নবজাগরণের আলোচনায় আমি দেখাতে চেয়েছি যে, ইংরেজ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠলো, বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা ও পাঠকও মূলতঃ তারাই, তারা প্রথম থেকেই স্বার্থ ও অনুভূতিত জীবন দৃষ্টির দিক থেকে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের সঙ্গে অযোগ সাধিয়ে দুপায়ুষ শ্রেণীতে পরিণত হয়। একদিকে ইংরেজ শাসন ও শোষণ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিলেও এই নতুন শ্রেণীর টিকে থাকা ও বেড়ে ওঠার প্রয়োজনে ইংরেজ শাসন ও শোষণ অপরিহার্য ছিল। সেজন্যই যে সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণ ইতিহাস ও জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে বা ফেটে পড়তে চেয়েছে তখনও এই শ্রেণী নতুন শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে এবং শোষক ইংরেজ ও শোষিত জনসাধারণের মধ্যে মধ্যস্থের সন্দেহজনক ভূমিকা পালন করেছে। আর এই ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায়ও ব্যাপক অর্থে পরিবর্তিত হয়নি। একদিকে সামন্তব্যবস্থার জমি ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চাকুরী ও অন্যদিকে ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে য়ুরোপীয় গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে

পরিচয়ের ফলে এই শ্রেণীর মানসিক গঠনে সুবিরোধ সৃষ্ট হয়ে উঠলো। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ইংরেজী শাসনের অবিরোধিতা, কৃষক সমাজের দুঃখে বেদনাবোধ ও সেই দুঃখের কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, উদার মানবতার গ্রহণ ইসলাম বিদ্বেষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই সুবিরোধ সৃষ্ট। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ যেহেতু এই সামাজিক পরিবেশ থেকে তাই বাংলা উপন্যাসও এই সুবিরোধের শিকার হয়ে বস্তুসাধন সমাজবাস্তবতা থেকে সরে এসেছে এবং বলাবাহুল্য, তার ফলে উপন্যাসিক সার্থকতা থেকেও অনেকটাই ভ্রষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তেমন তফাৎ সত্ত্বেও একই পথের পথিক। এঁদের ত্রিধা ও দ্বিধা ও তার কারণ যথাস্থানে আলোচনার চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে, বাংলা উপন্যাসের এই তিন দিগ্‌পাল একটি উপন্যাসের সার্থকতা যে নির্দিষ্ট দেশকালের ঐতিহাসিক সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরায়, তাঁদের উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁদের সেই দেশকালের ঐতিহাসিক সমাজবাস্তবতাকে যথাযথ সুপায়ণের মাধ্যমে উপন্যাসিক সার্থকতায় পৌঁছিয়ে দেননি কিন্তু সত্যাসত্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তেমন বা তারচেয়ে যা পেরেছিলেন, সেটাই দেখার চেষ্টা করেছি। চেষ্টাই সার করেছি, সফলতা সুধীজনের বিচার্য ।।